## দ্বিতীয় অধ্যায়

# কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও সাইবার নিরাপত্তা

### এ অধ্যায় শেষে আমরা...

- কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- Software uninstall এবং Software delete -এর পার্থক্য করতে পারব;
- সাইবার ঝুঁকি ও তথ্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা পারব;
- মানুষের জীবনে সাইবার অপরাধের প্রভাব ও সাইবার আক্রমণের শিকার হলে করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা পারব;
- অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারব;
- অতিমাত্রায় গেমস খেলার নেতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সফটওয়্যার পাইরেসির বিষয়টি বর্ণনা করতে পারব;
- কপিরাইট আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইন্টারনেটে তথ্যের অবাধ প্রবাহের সাথে সাথে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কম্পিউটারের ট্রাবল শ্যুটিং-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কম্পিউটারের সাধারণ সমস্যার ট্রাবলশ্যুট করতে পারব।

## কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ

কম্পিউটার হচ্ছে কিছু ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ (হার্ডওয়্যার) ও সফটওয়্যারের সমন্বিতরূপ। সুতরাং এর থেকে ভালো সেবা (সার্ভিস) পেতে হলে একে অবশ্যই পরিচর্যা করতে হবে। বাইরের বিভিন্ন নিয়ামক যেমনঃ আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎক্ষেত্র, চুম্বকক্ষেত্র,ধূলিকণা, ধোঁয়া, পানি ইত্যাদির প্রভাব থেকে কম্পিউটারকে রক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি এর মধ্যে থাকা অপারেটিং সিস্টেম ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারও আপডেট রাখতে হবে। কাজেই কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ বলতে কম্পিউটারকে কাজের উপযোগী করে ভাল অবস্থায় রাখার প্রচেষ্টাকে বুঝায়। কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ দুই প্রকারের হতে পারে। যথা-

১। **প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ (Preventive maintenance) :** কম্পিউটারের ফল্ট (fault) বা সমস্যা তৈরি হওয়ার পূর্বেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়াকে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ বলা হয়। ব্যবহারকারী নিজে নিজেই এই ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। যেমন-ভাইরাস স্ক্যান, ডিস্ক ক্লিন, ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন, সফটওয়্যার আপডেট ইত্যাদি।

২। **সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণ (corrective maintenance) :** কম্পিউটারের ফল্ট বা সমস্যা তৈরি হওয়ার পর তা মেরামত বা পরিবর্তন করে কম্পিউটারকে কর্মক্ষম করাকে সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণ বলা হয়। সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাধারণত কম্পিউটার টেকনিশিয়ানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়,কম্পিউটারের আশেপাশে কোনো ধাতব পদার্থ বা চৌম্বক জাতীয় পদার্থ রাখা যাবে না। এছাড়া ইলেকট্রিক শক থেকে রক্ষা পাবার জন্য অবশ্যই কম্পিউটারের বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থায় আর্থিং থাকা উচিত।

## কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব

**ঘটনা ১ :** রায়না কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বাবার কাছে বায়না ধরেছিল একটি ল্যাপটপ কিনে দেবার জন্য। বাবা প্রথম সাময়িকের ফল ভালো হওয়ায় রায়নাকে একটি কোর আই ফাইভ প্রসেসরযুক্ত একটি ল্যাপটপ কিনে দিলেন। ল্যাপটপ পেয়ে এবং এর গতি দেখে রায়না মুগ্ধ। সে কিছুদিনের মধ্যেই অনেক সফটওয়্যার ইনস্টল করে ফেলল। কিন্তু রায়না লক্ষ করল তার ল্যাপটপটি আস্তে আস্তে ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে। এক বছরের মাথায় এসে রায়না দেখল তার ল্যাপটপটি এতটাই ধীর হয়ে গেছে যে, কাজ করতে গিয়ে রায়না মহা বিরক্ত। কিছুদিন পর সে বাবাকে আরেকটি ল্যাপটপ কিনে দেওয়ার জন্য আবদার করল।

**ঘটনা ২ :** অংকন তার কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন নিয়েছে। এখন সে প্রায়ই ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে। এতে তার লেখাপড়ার অনেক উপকার হচ্ছে। লেখাপড়া ছাড়াও সে বন্ধুদের ই-মেইল করা, গান শোনা ও ছবি দেখার কাজেও ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ইদানীং সে দেখছে কম্পিউটারটি কোনো কারণ ছাড়াই মাঝে মধ্যে রিস্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও মাঝে মাঝে অংকনের ইচ্ছা ছাড়াই বিভিন্ন ওয়েব সাইটে ঢুকে যাচ্ছে। একদিন ইউএসবি পোর্টে পেনড্রাইভ প্রবেশ করালে সে অবাক হয়ে দেখল তার সব ফাইল শর্টকাট হয়ে গেছে। মূল ফাইলগুলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

## কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব

**ঘটনা ১ :** রায়না কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বাবার কাছে বায়না ধরেছিল একটি ল্যাপটপ কিনে দেবার জন্য। বাবা প্রথম সাময়িকের ফল ভালো হওয়ায় রায়নাকে একটি কোর আই ফাইভ প্রসেসরযুক্ত একটি ল্যাপটপ কিনে দিলেন। ল্যাপটপ পেয়ে এবং এর গতি দেখে রায়না মুগ্ধ। সে কিছুদিনের মধ্যেই অনেক সফটওয়্যার ইনস্টল করে ফেলল। কিন্তু রায়না লক্ষ করল তার ল্যাপটপটি আস্তে আস্তে ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে। এক বছরের মাথায় এসে রায়না দেখল তার ল্যাপটপটি এতটাই ধীর হয়ে গেছে যে, কাজ করতে গিয়ে রায়না মহা বিরক্ত। কিছুদিন পর সে বাবাকে আরেকটি ল্যাপটপ কিনে দেওয়ার জন্য আবদার করল।

**ঘটনা ২ :** অংকন তার কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন নিয়েছে। এখন সে প্রায়ই ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে। এতে তার লেখাপড়ার অনেক উপকার হচ্ছে। লেখাপড়া ছাড়াও সে বন্ধুদের ই-মেইল করা, গান শোনা ও ছবি দেখার কাজেও ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ইদানীং সে দেখছে কম্পিউটারটি কোনো কারণ ছাড়াই মাঝে মধ্যে রিস্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও মাঝে মাঝে অংকনের ইচ্ছা ছাড়াই বিভিন্ন ওয়েব সাইটে ঢুকে যাচ্ছে। একদিন ইউএসবি পোর্টে পেনড্রাইভ প্রবেশ করালে সে অবাক হয়ে দেখল তার সব ফাইল শর্টকাট হয়ে গেছে। মূল ফাইলগুলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

উপরের ঘটনা দুটো থেকে তোমরা কী বুঝলে? তোমাদের অনেকের অভিজ্ঞতার সাথে মিলে যাচ্ছে? তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে এতদিনে তোমাদের অনেক কিছুই জানা হয়ে গেছে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রসেসর ও সফটওয়্যার নির্ভর যন্ত্রই হলো মূলযন্ত্র। নতুন একটি কম্পিউটার তা ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট যাই হোক না কেন দেখবে খুব ভালো বা দ্রুতগতিতে কাজ করছে। কিন্তু কিছুদিন ব্যবহার করার পরে দেখবে এটি ক্রমশ ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ পুরানো হলে যন্ত্রটি কেমন যেন ধীর হয়ে যায়। অনেক সময় একটি কমান্ড দিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। মাঝে মাঝে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, রাগান্বিত হয়ে আরেকটি নতুন কম্পিউটার কিনে ফেলতে ইচ্ছা করে!

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় তাহলে কী? এখানেই রয়েছে কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব। নিচের শ্রেণিতে তোমরা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কিছুটা জেনেছ। বেশিরভাগ মানুষেরই আইসিটি যন্ত্রপাতি বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি করতে ভালো লাগে না। কিন্তু তারপরও এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যদি তোমার আইসিটি যন্ত্র বা কম্পিউটারটি সচল ও পূর্ণমাত্রায় কার্যক্ষম রাখতে চাও তবে অবশ্যই এটির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। একাজের জন্য তোমার যন্ত্রপাতি বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আসলে আমরা এখানে আইসিটি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে সফটওয়্যার ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলছি।

তোমার আইসিটি যন্ত্রটিতে যদি মাইক্রোসফট কোম্পানির উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে (বিশ্বের বেশিরভাগ কম্পিউটারে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয়) থাকে তবে অপারেটিং সিস্টেম সবসময় হালনাগাদ বা আপডেট করতে হবে। ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকলে এ আপডেটগুলো সাধারণত স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে থাকে। অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমও প্রায় একই ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে। তাছাড়া তোমাকে অবশ্যই মাঝে মাঝে রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে কম্পিউটারকে সচল ও গতিশীল রাখার জন্য। যদি রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ ব্যবহার না কর তোমার কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রটি ঠিকভাবে কাজ করবে না এবং তোমার জন্য অনেক সময় বিরক্তির কারণ হবে।

এছাড়াও প্রত্যেকবার কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় বেশ কিছু টেম্পোরারি ফাইল তৈরি হয়। অনেকদিন এ ফাইলগুলো না মুছে দিলে হার্ডডিস্কের অনেকটা জায়গা দখল করে রাখে এবং কম্পিউটারের গতিকে ধীর করে দেয়। সে জন্য আমাদের সবারই উচিত সফটওয়্যারের সাহায্য নিয়ে টেম্পোরারি ফাইলগুলো মুছে দেওয়া। এতে হার্ডডিস্কের বেশ খানিকটা জায়গা খালি হবে আবার কম্পিউটারের কাজ করার গতিও বেড়ে যাবে অনেক।

ইদানীং ইন্টারনেট ব্যবহার করা ছাড়া আইসিটি যন্ত্রের ব্যবহার কল্পনা করা যায় না। ইন্টারনেট ব্যবহার করলে তোমার ইন্টারনেট ব্রাউজারের ক্যাশ মেমোরিতে অনেক কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল জমা হয়। এতে আইসিটি যন্ত্রটি ক্রমান্বয়ে ধীর হয়ে যায়। প্রতিদিন সম্ভব না হলেও কিছুদিন পর পর ক্যাশ মেমোরি পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। এ কাজটি করতে সফটওয়্যার তোমাকে সাহায্য করবে।

এন্টিভাইরাস, এন্টি স্পাইওয়্যার ও এন্টি ম্যালওয়্যার ছাড়া বর্তমানে আইসিটি ডিভাইস ব্যবহার করা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এধরনের সফটওয়্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম যার মাধ্যমে আইসিটি যন্ত্র ব্যবহারকারীগণ তাদের যন্ত্রে ভাইরাসসহ ম্যালওয়্যার বা স্পাইওয়্যারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। পাশাপাশি নির্বিঘ্নে তাদের যন্ত্র বা যন্ত্রগুলো ব্যবহার করতে পারেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এখন অনেক এন্টিভাইরাস এবং এন্টি ম্যালওয়্যার বা এন্টি স্পাইওয়্যার বিনামূল্যে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যায়। এমনকি এ সফটওয়্যারগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপডেট করা যায়। হালনাগাদ বা আপডেটেড এন্টিভাইরাস ছাড়া আইসিটি যন্ত্র ব্যবহার করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

কম্পিউটারের কাজ করার গতি বজায় রাখার জন্য প্রায় সব ব্যবহারকারী ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার ব্যবহার করে থাকে। এ প্রোগ্রামগুলো সাধারণত অপারেটিং সিস্টেমের সাথে যুক্ত থাকে। এ সফটওয়্যার দুটো হার্ডডিস্কের জায়গা খালি করে এবং ফাইলগুলো এমনভাবে সাজায় যাতে কম্পিউটার গতি বজায় রেখে কাজ করতে পারে।

## সফটওয়্যার ইনস্টলেশন ও আনইনস্টলেশন

আমরা সবাই জানি আইসিটি যন্ত্রগুলো সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ সফটওয়্যারগুলো কম্পিউটার বা অন্যান্য যন্ত্রে ইনস্টল করতে হয়। আমরা যখন কোনো আইসিটি যন্ত্র কিনি তখন বিক্রেতা সাধারণত আমাদের জিজ্ঞাসা করে আমাদের কোন কোন সফটওয়্যার প্রয়োজন। অতঃপর অপারেটিং সফটওয়্যারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারগুলো বিশেষজ্ঞ দিয়ে ইনস্টল করে বিক্রেতা যন্ত্রটি আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। এভাবে আমরা নিজেদের প্রয়োজনমতো আইসিটি যন্ত্র তথা কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি।

অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রক্রিয়া একটু জটিল এবং এর জন্য কিছু বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়াও আইসিটি যন্ত্র ব্যবহার করতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। এ সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারকারীর যন্ত্রটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ইনস্টল করতে হয়।

কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করার পূর্বে নিচের বিষয়গুলো লক্ষ রাখা প্রয়োজন:

- যে সফটওয়্যার ইনস্টল করা হবে তা তোমার যন্ত্রের হার্ডওয়্যার সাপোর্ট করে কিনা;
- read me ফাইলটিতে জরুরি কিছু কাজের কথা লেখা আছে কিনা পড়ে নিতে হবে;
- ইনস্টলেশনের সময় অন্য সকল কাজ বন্ধ আছে কিনা (বন্ধ না থাকলে অনেক সময় নতুন সফটওয়্যার ইনস্টল করতে ঝামেলা হয়);
- এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার বন্ধ আছে কিনা; এবং
- অপারেটিং সিস্টেমের এডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি আছে কিনা (বিশেষ কোনো যন্ত্র ছাড়া প্রায় সব যন্ত্রেরই এ অনুমোদন দেওয়া থাকে)।

অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়া অন্যান্য সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রক্রিয়া অনেকটাই অপারেটিং সিস্টেমের ওপর নির্ভর করে। তবে এ প্রক্রিয়া অনেকটা একই ধরনের। কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হলে প্রথমেই আমাদের সফটওয়্যারটির সফট বা ডিজিটাল কপি প্রয়োজন হবে। এ সফট কপিটি সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ বা ইন্টারনেট থেকে পাওয়া যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফটওয়্যারগুলোর সাথে Auto run নামে একটি প্রোগ্রাম সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। তোমাদের কম্পিউটারে সিডি, ডিভিডি বা পেনড্রাইভ প্রবেশ করালে Auto run প্রোগ্রামটি সচল হয়ে যায় এবং সফটওয়্যারটি setup করার অনুমতি চায়। অনুমতি প্রদান করার পর পরবর্তী ধাপগুলো অনুসরণ করলেই সফটওয়্যারটি তোমার যন্ত্রে ইনস্টল হয়ে যাবে। সাধারণত যন্ত্রটি restart করলেই ইনস্টলকৃত প্রোগ্রামটি ব্যবহার করা শুরু করা যায়।

## সফটওয়্যার আনইনস্টলেশন

এখন মনে কর ইনস্টল করা কোনো একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করার আর প্রয়োজন নেই। তাহলে আমরা কী করব? বেশিরভাগ ব্যবহারকারী সফটওয়্যারটি তার যন্ত্রেই রেখে দেয়। কিন্তু এতে হার্ডডিস্কের অনেকটা জায়গা নষ্ট হয়। আবার অনেক সময় আইসিটি যন্ত্রটি পরিচালনা করতে ঝামেলা সৃষ্টি করে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আনইনস্টল করে ফেলা।

এখন প্রশ্ন হলো আনইনস্টল কীভাবে করব? এ কাজটি করতেও অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার আমাদের সাহায্য করে থাকে। প্রায় সব অপারেটিং সিস্টেমের কাজের ধরন একই। তবে এন্ড্রয়েড চালিত যন্ত্র বিশেষ করে হাতের আঙ্গুলের স্পর্শ দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ টাচস্ক্রিনযুক্ত স্মার্টফোনগুলো থেকে সফটওয়্যার আনইনস্টল করা খুবই সহজ। সেটিংস থেকে অ্যাপ্লিকেশন সিলেক্ট করে নির্দিষ্ট সফটওয়্যারটিতে টাচ করলে পর্দায় একটি মেনু আসবে। সেখানে আনইনস্টল লেখা জায়গায় টাচ করার পর সফটওয়্যারটি আনইনস্টল হয়ে যাবে।

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ-এর অপারেটিং সিস্টেম যা কিনা বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ তাদের আইসিটি যন্ত্রে তথা কম্পিউটারে ব্যবহার করে থাকে, সেসব যন্ত্র হতে সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে হলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

প্রথমে স্টার্ট বাটন থেকে কন্ট্রোল প্যানেলে যেতে হবে। অতঃপর ডাবল ক্লিক করে 'অ্যাড অর রিমুভ' অথবা 'আনইনস্টল প্রোগ্রাম'-এ ঢুকতে হবে।

এরপর যে প্রোগ্রামটি আনইনস্টল করতে চাও সেটি খুঁজে ক্লিক করে আনইনস্টলে ক্লিক করলেই ফাইলটি আনইনস্টল হতে শুরু করবে। ফাইল বড়ো হলে আনইনস্টল হতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে। আনইনস্টল করার পর সাধারণত কম্পিউটার রিস্টার্ট করতে হয়। তবে কোনো সফটওয়্যার আনইনস্টল করার সময় নিশ্চিত হয়ে তা করতে হবে। অন্যথায় ভুলক্রমে এমন সফটওয়্যার আনইনস্টল হতে পারে, যার কারণে তোমার যন্ত্রটিতে পুনরায় সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা ছাড়া চালানো সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

**কাজ**

প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিক্ষক নির্দেশিত একটি সফটওয়্যার আনইনস্টল কর।

## সফটওয়্যার ডিলিট

আমরা জানি ডিলিট অর্থ মুছে ফেলা। মূলত সফটওয়্যার আনইনস্টল করার মাধ্যমে আমরা আমাদের আইসিটি যন্ত্র হতে ইনস্টল করা যেকোনো সফটওয়্যার মুছে ফেলতে পারি। নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে তাহলে ডিলিট দিয়ে কী করব? কম্পিউটার বা অন্য যেকোনো আইসিটি যন্ত্রে কোনো সফটওয়্যার একবার ইনস্টল করলে আনইনস্টলের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায় না। আবার নিয়ম না মেনে শুধু সফটওয়্যারটি ডিলিট করে দিলে সফটওয়্যারটি মুছে তো যায়ই না বরং আরো সমস্যা তৈরি করে। আনইনস্টল করলে সফটওয়্যারটির কিছু অংশ অপারেটিং সিস্টেমের রেজিস্ট্রি ফাইলে থেকে যায়। নিয়ম অনুসরণ করে ডিলিট করলে যেকোনো সফটওয়্যার সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা সম্ভব। নিচে নিয়মটি দেখানো হলো। এ কাজটি করতেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

ডিলিট করতে যা করতে হবে : প্রথমে পূর্বের নিয়মে সফটওয়্যারটি আনইনস্টল করতে হবে। পরে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

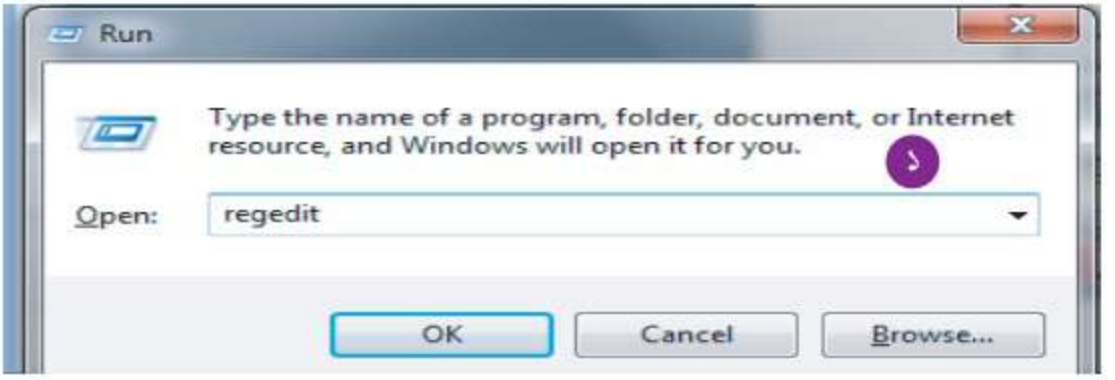


১. প্রথমে কীবোর্ডের + r একসাথে চেপে Run Command চালু করতে হবে। তারপর regedit লিখে ok বাটন ক্লিক করতে হবে।

২. ফাইল মেনুতে প্রবেশ করতে হবে।

৩. Export -এ ক্লিক করতে হবে।

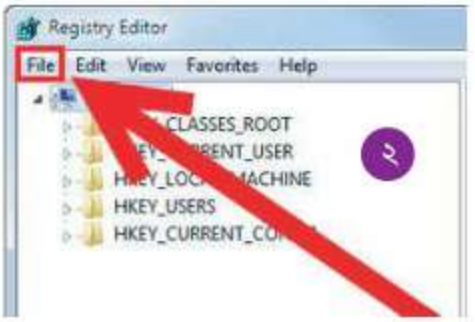


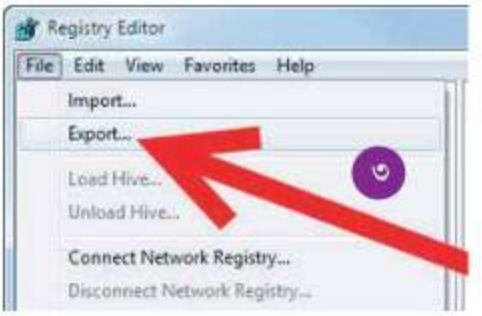

৪. অপারেটিং সফটওয়্যার যে ড্রাইভে রয়েছে অর্থাৎ C সিলেক্ট করতে হবে।

৫. নাম দিয়ে ফাইলটি সেভ করতে হবে। এটি খুবই জরুরি। কোনো ভুল হলে যাতে সিস্টেম ঠিক করা যায়।

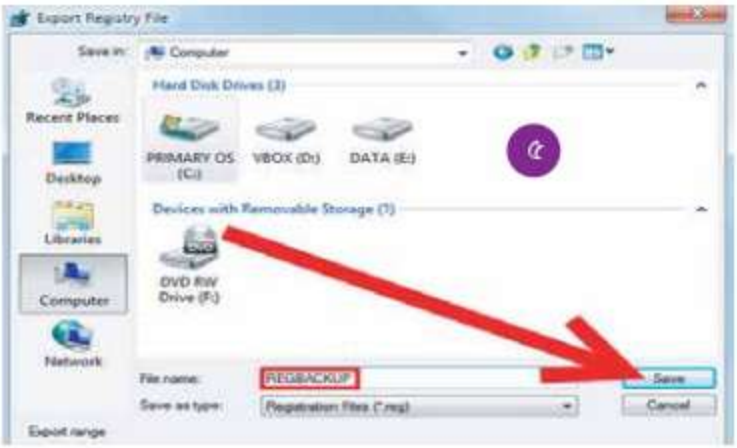


৬. অতঃপর Edit -এ প্রবেশ করতে হবে।

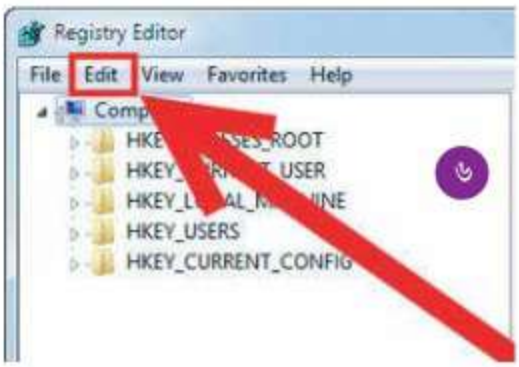


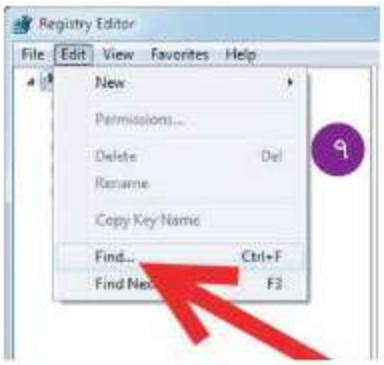


৭. Find -এ যেতে হবে।

৮. যে সফটওয়্যারটি ডিলিট করতে চাই তার নাম খুঁজতে হবে, যেমন এখানে AUDIALS

৯. Find Next -এ ক্লিক করতে হবে।

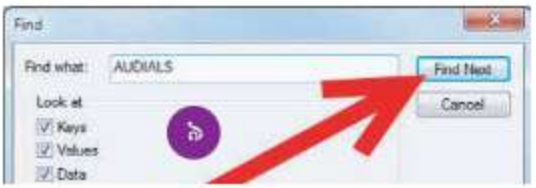


১০. এভাবে সিলেক্ট করতে হবে।

১১. এবার ডান বাটন ক্লিক করে Delete -এ ক্লিক করে করতে হবে।

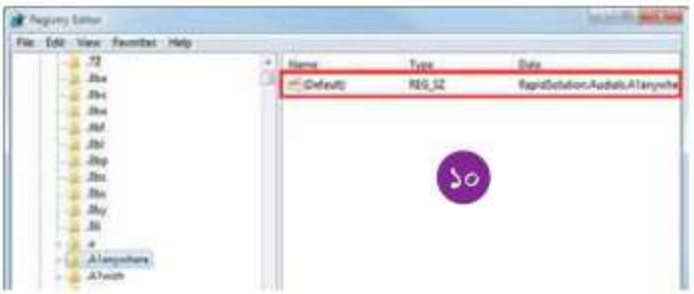

১২. সবশেষে কীবোর্ডের F3 চেপে রেজিস্ট্রির সব জায়গা থেকে ঐ নামের ফাইলগুলো মুছে দিতে হবে। এভাবেই সম্পূর্ণ হবে পুরো সফটওয়্যার ডিলিট করার প্রক্রিয়া।

> দলগত কাজ
>
> আনইনস্টল এবং ডিলিটের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে উপস্থাপন কর।

## তথ্যের নিরাপত্তা ও সাইবার ঝুঁকি

বর্তমান সময়ে তথ্য মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তথ্যের প্রবেশাধিকারের বিবেচনায় উন্মুক্ত তথ্য ও গোপনীয় তথ্য নামে তথ্যের দুটি প্রকারভেদ রয়েছে। উন্মুক্ত তথ্যে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে এবং সীমাবদ্ধতা ছাড়াই যে কেউ শেয়ার করতে পারে। যেমন: সংবাদ, প্রবন্ধ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রেস রিলিজ ইত্যাদি। এটি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য তৈরি হওয়ায় এটির জন্য তেমন কোনো জটিল সুরক্ষার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে, গোপনীয় তথ্য অনুমোদিত ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আইনি বাধ্যবাধকতা দ্বারা সুরক্ষিত। যেমন: বাণিজ্যিক চুক্তি, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি। অনুমতি ছাড়া গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করলে আইনি জটিলতায় পরতে হতে পারে অথবা আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা লাগতে পারে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যক্তিগত তথ্য প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়। এখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি বলতে তথ্য যোগাযোগ, হিসাব-নিকাশ এবং অটোমেশনের মতো কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বা ডিভাইস এবং সিস্টেমকে বোঝায় যা বাইনারি আকারে ডেটা প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং প্রেরণ করতে পারে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির এই প্রসারের ফলে, বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধের মাধ্যমে তথ্য নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়ে মানুষ প্রতারণার শিকার হচ্ছে। সাইবার জগৎ হলো একটি ডিজিটাল স্থান যেখানে মানুষ একে অপরের সাথে

ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে এবং তথ্য পেতে পারে। এটি বাহ্যিক জগতের সমান্তরাল এমন একটি জগৎ যা ইন্টারনেট, ডেটা এবং কোড দ্বারা গঠিত। সাইবার জগৎ ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান এবং বিকশিত হচ্ছে এবং এটি আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে।

## সাইবার অপরাধ

আমরা জানি সমাজ ও আইনবিরোধী যে কোনো কর্মকাণ্ডই অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে যেসব অপরাধ অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে হয়ে থাকে সেগুলোকে সাইবার অপরাধ বলে। সাইবার অপরাধ সংঘটনে কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস এবং ইন্টারনেট অবশ্যই ব্যাবহৃত হয় আবার কখনো কখনো ডিভাইস বা নেটওয়ার্ক নিজেই সাইবার আক্রমণের শিকার হয়। সাইবার অপরাধীরা আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে আমাদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেলতে পারে। তাই সাইবার অপরাধ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা বিষয়ক ঝুঁকি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার উপায় সম্পর্কে জানা আমাদের সকলের জন্য অতীব জরুরি। ডিজিটাল মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ রয়েছে, যার মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হয়। নিচে কিছু সাইবার অপরাধ উল্লেখ করা হলো।

- হ্যাকিং (Hacking)
- ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক (Brute Force Attack)
- ডেটা ইন্টারসেপশন (Data Interception)
- ডি ডস অ্যাটাক (DDos Attack)
- কম্পিউটার ম্যালওয়্যার (Computer Malware) ইত্যাদি।

## হ্যাকিং (Hacking)

সাধারণত অনুমতি ব্যতীত কোনো ওয়েবসাইট বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে তা ব্যবহার করা অথবা তার পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়াকে হ্যাকিং বলে। যে হ্যাকিং করে তাকে হ্যাকার (hcaker) বলে। হ্যাকিং বৈধ ও অবৈধ হতে পারে। কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের সিস্টেমের সিকিউরিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হ্যাকার নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ প্রাপ্ত হ্যাকারদের কাজকে বৈধ হ্যাকিং বলে। এরা সিস্টেম সিকিউরিটি চেক করে; তবে সিস্টেমের কোন ক্ষতি করে না। যেমন- UNIX সিস্টেম চেক করার জন্য অনেক বৈধ হ্যাকার রয়েছে। এদেরকে হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার বলা হয়। অবৈধভাবে যারা হ্যাকিং করে তাদেরকে ক্রেকার (craker)ও বলে। অবৈধ হ্যাকার বা ক্রেকাররা ইন্টারনেট এবং অন্যান্য নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ডেটা চুরি অথবা নষ্ট করে দেয়। এদের কাছে সাধারণত বেশ কিছু টেকনিক থাকে যা ব্যবহার করে এরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সফট্ওয়্যার সিস্টেমের দুর্বলতা খুব সহজে খুঁজে বের করে পাসওয়ার্ড জেনে ফেলে। ফলে সহজেই ক্ষতি সাধন করতে পারে। এদেরকে ব্লাক হ্যাট হ্যাকার বলে।

হ্যাকিং অপরাধের প্রবণতা দিনদিন বেড়েই চলেছে। হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে সাইবার অপরাধ সংঘটিত হয়। হ্যাকাররা অন্যের ই-মেইল দেখতে পারে, ওয়েব সার্ভারে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারে অথবা নেটওয়ার্কে ফাইল চুরি করতে পারে।

## ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক (Brute Force Attack)

বাস্তব জীবনে একজন চোর যেমন একটি তালাবদ্ধ রুমে প্রবেশ করার জন্য বিভিন্ন রকম চাবি দিয়ে সেই তালা খোলার চেষ্টা করে তেমনি ডিজিটাল মাধ্যমে অপরাধীরা মানুষের বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্ট যেমন ব্যাংক, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইমেইল অ্যাকাউন্ট, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ডিজিটাল ডিভাইসেও অবৈধভাবে প্রবেশ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে এবং ঐ গুলো নিয়ে একের পর এক অনুমান নির্ভর চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে তারা সফলও হয় এবং সফল হলে তারা ঐ ব্যক্তির বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে। ঐ চুরি করা ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করে থাকে। এটি এক ধরনের সাইবার আক্রমণ যা অবশ্যই একটি গুরুতর সাইবার অপরাধ। এই ধরনের সাইবার হামলা ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক (Brute Force Attack) নামে পরিচিত।

এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একজন আক্রমণকারী কোন সিস্টেমে অননুমোদিত অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত পাসওয়ার্ড বা এনক্রিপশন কি-গুলোর বিভিন্ন সংমিশ্রণ নিয়ে পদ্ধতিগতভাবে চেষ্টা করে। এটি ট্রায়াল এবং এরর (trial and error) এর উপর নির্ভর করে স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে সঠিকভাবে প্রতিটি বিকল্প খুঁজে সফল না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা চালিয়ে যায়।

এটি প্রতিরোধ করার জন্য কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন শক্তিশালী পাসওয়ার্ড বা অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকলে এটি কার্যকর হতে পারে।

## ডেটা ইন্টারসেপশন (Data Interception)

কৃষিকাজের জন্য জমিতে পানি সেচ দেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত পানির পাম্প থেকে জমি বা ক্ষেত-এ নালা করে অথবা পাইপের সাহায্যে পানি দেওয়া হয়। এই নালা বা পাইপের মাঝপথে যদি কেউ তা কেটে দেয় অথবা পানির পাইপটি ফুটো করে দেয়, তাহলে যে পরিমাণ পানি পাওয়ার কথা তা পাওয়া যাবে না। এর ফলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মাঝপথে পানি অসৎ উপায়ে যেন কেউ না নিতে পারে তার জন্য নজরদারির ব্যবস্থা করতেহবে। ঠিক একইভাবে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের সময় প্রাপক এবং প্রেরকের মধ্যবর্তী কেউ তা আড়ি পেতে চুরি করতে পারে। এই চুরি হবার প্রক্রিয়াটি ডেটা ইন্টারসেপশন নামে পরিচিত।

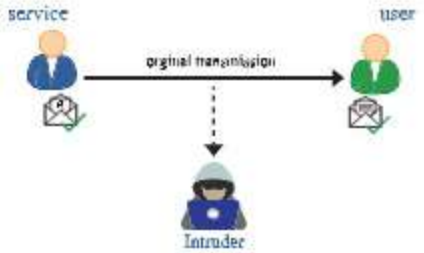


সাধারণত সফটওয়্যার বা অ্যাপস-এ এন্ড টু এন্ড ডেটা এনক্রিপশন করা থাকলে, মধ্যবর্তী কারও পক্ষে তথ্য (ম্যাসেজ, ছবি, ভিডিয়ো, ভয়েস কল রেকর্ড, ডকুমেন্ট ইত্যাদি) চুরি করা অসম্ভব হয়ে যায়। এনক্রিপশন (Encryption) হলো মেসেজ, ডেটা বা তথ্যকে এনকোড করার এমন একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যা অনুমোদনহীন কেউ পড়তে বা বুঝতে পারে না। এর ফলে অনুমোদনহীনদের কাছে মেসেজ, ডেটা বা তথ্য দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। নেটওয়ার্কের পাবলিক পথ দ্বারা যে সকল গোপনীয় ডেটা স্থানান্তরিত হয় তাদেরকে সাধারণত বিশেষ কোডের মাধ্যমে এনক্রিপ্ট করে প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ ডেটার গোপনীয়তা রক্ষা বা সিকিউরিটির জন্য ডেটাকে এনক্রিপ্ট করা হয়।

## ডি ডস আক্রমণ (DDoS-Distributed Denial of Service)

কোনো ব্যক্তি যখন টিভিতে সাক্ষাৎকার দেয় তখন অনেকেই যদি একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন ওই ব্যক্তিকে করেন তবে ওই ব্যক্তির পক্ষে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ভালোভাবে কথা বলা কঠিন হয় এবং এতে সময়ক্ষেপণও হয়। কারণ তিনি কোনটি রেখে কোনটি বলবেন তার খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন। ঠিক একইভাবে ডিজিটাল জগতে ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়েল অফ সার্ভিস বা ডি ডস আক্রমণ হলো একই সময়ে একাধিক ডিভাইস ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট টার্গেটে আক্রমণ করা।

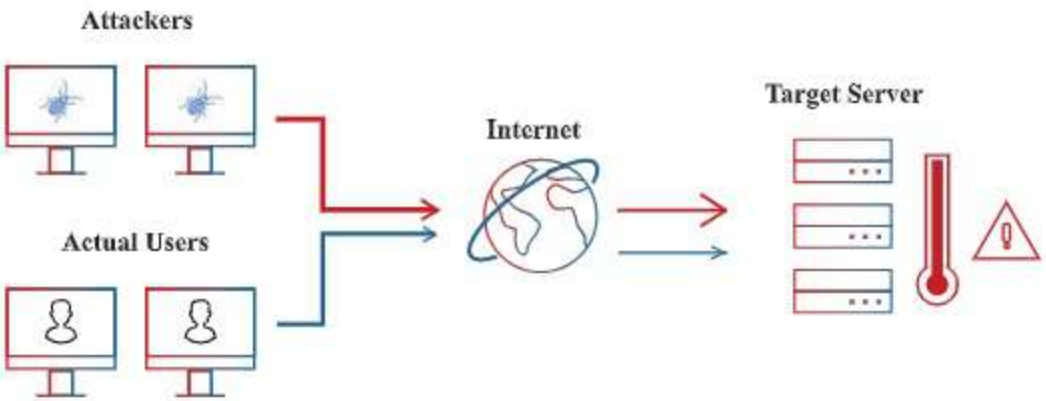


DDoS আক্রমণে একাধিক কম্পিউটার বা ডিভাইস কোনো ওয়েবসাইট বা অনলাইন সেবাকে প্রচুর পরিমাণে ট্র্যাফিকের সাথে প্লাবিত করতে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে এটি ধীরগতির হয়ে যায় বা ক্রাশ (crash) হয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য হল সিস্টেমটিকে মোহাবিষ্ট করা যাতে প্রকৃত ব্যবহারকারীরা এটি অ্যাক্সেস বা ব্যবহার করতে না পারে।

ম্যালওয়্যার (malware) হলো ইংরেজি Malicious Software এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মোবাইল, কম্পিউটার, সার্ভার, ওয়েবসাইট অথবা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ক্ষতি করার জন্য ডিজাইন ও উন্নয়ন করা হয়েছে এমন সফ্টওয়্যারকে ম্যালওয়্যার বলে।

এই সফটওয়্যার মোবাইল, কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহারকারী স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে। তবে যদি কোনো সফ্টওয়্যার তার অক্ষমতার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে কম্পিউটার সিস্টেমে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রে তাকে ম্যালওয়্যার বলা চলে না; একে সফটওয়্যার বাগ্ (bug) বলা হয়।
ম্যালওয়্যার এমন এক জাতীয় ক্ষতিকর সফ্টওয়্যার যা কম্পিউটার, মোবাইল বা অন্য কোনো ডিজিটাল সিস্টেমের স্বাভাবিক কাজকে ব্যাহত করতে, গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে, কোনো সংরক্ষিত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় অবৈধ অনুপ্রবেশ করতে বা অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপন দেখাতে ব্যবহার করা হয়। ম্যালওয়্যার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা- কম্পিউটার ভাইরাস (computer viruses), ওয়ার্ম (worms), ট্রোজান হর্স (trojan horses), স্পাইওয়্যার (spyware), র‍্যানসামওয়্যার (ransomware), অ্যাডওয়্যার (adware), রুটকিটস্ (rootkits) ও স্প্যামিং (spamming) ইত্যাদি।

## সাইবার বুলিং (Cyber bullying)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে জোরপূর্বক কোনো কিছু করতে বাধ্য করাকে সাইবার বুলিং বা সাইবার সন্ত্রাস বলা হয়। কাউকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা, হুমকি প্রদান করা, আতঙ্ক সৃষ্টি করা, অনুমতি ব্যতীত কারো ব্যক্তিগত তথ্য বা ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা, সামাজিক মাধ্যমগুলোতে বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রকাশ করা বা গুজব ছড়ানো, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা বা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ছড়ানো এসব কিছুই সাইবার সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত।

সাইবার সন্ত্রাসের জন্য মোবাইল, কম্পিউটার, ট্যাবলেট ইত্যাদি যন্ত্রাংশ এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়েবসাইট, ম্যাসেজ, ই-মেইল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ই-মেইলে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বিব্রতকর ছবি, ভিডিয়ো, আপত্তিকর বা অপমানজনক মন্তব্য দ্বারা ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে হেয় করা হয় এবং ব্যক্তিগত জীবনকে বিপর্যস্ত করা হয়।
সাধারণত শিশু এবং কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের ক্ষেত্রে সাইবার সন্ত্রাস বেশি ঘটে থাকে। এর ফলে যেমন তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনই তাদের ভেতর হীনমন্যতা বোধ, হতাশা, আতঙ্ক এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতা তৈরি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমে বা ওয়েবসাইটে কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য প্রকাশ করার পর তা মুছে ফেলা অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব। আবার ফেইক আইডির ক্ষেত্রে এর উৎস বা প্রকাশকারীর পরিচয় খুঁজে বের করাও অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই আমাদেরও বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

## ফেইক নিউজ

সংবাদ হিসেবে উপস্থাপিত কোনো মিথ্যা বা বিভ্রান্তিক তথ্য যা মানুষকে প্রতা ত করা বা মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তাই-ই ফেইক নিউজ। এটি সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট গল্প বা বিকৃত তথ্যের রূপ নিতে পারে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়েবসাইট বা অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা বা একটি নির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা প্রচার করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অত্যধিক ব্যবহারের এই যুগে, ফেইক নিউজ বিস্তার অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঘটছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ঘটা ফেইক নিউজের ফলে পৃথিবীব্যাপী অনেক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। 'চিলে কান নিয়ে গেছে' এমন সংবাদে চিলের পিছে না দৌড়ে সবার আগে কানে হাত দিয়ে দেখা উচিত। ঠিক একইভাবে অনলাইনে কোনো পোস্ট বা খবর দেখলে তা যাচাই করে বিশ্বাস করা উচিত। সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নকল অর্থাৎ ছদ্ম নাম ধারণ করে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা খবর বা গুজব রটিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৬ মোতাবেক সাইবার বুলিং এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ফেইক নিউজ ছড়ানোর জন্য অপরাধীর সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে অথবা সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা

সাইবার আক্রমণের শিকার হলে নিচের কাজগুলো করা যেতে পারে। যথা-

১। যত দ্রুত সম্ভব ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯, ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯ অথবা আইসিটি হেল্পলাইন-এ যোগাযোগ করতে হবে।

২। প্রযুক্তিতে দক্ষ এমন কারোর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৩। প্রমাণক সহ www.rab.gov.bd ওয়েবসাইটে অভিযোগ পাঠাতে হবে।

৪। পিতা-মাতা বা পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করতে হবে।

৫। ডিজিটাল ডিভাইস বন্ধ করে রাখতে হবে।

৬। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC)-বরাবর লিখিত অভিযোগ জানাতে হবে।

৭। বিষয়টি অপরিচিত কারো সাথে বা উন্মুক্তভাবে সবার সাথে শেয়ার করা যাবে না।

৮। নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরি বা জিডি করতে হবে।

৯। ভোক্তা অধিকারের চর্চা করতে হবে।

১০। অপরাধের প্রমাণগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

আমরা এই ধরনের ঘটনার শিকার হলে তা নিজের মধ্যে না রেখে মা-বাবা এমনকি শিক্ষককে জানিয়ে খুব দ্রুতই নিকটস্থ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করব। আমাদের দেশে এখন অনলাইনেই জিডি বা সাধারণ ডায়েরি করা যায়। এ জন্য আমাদের যে কোনো ইন্টারনেট ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে https://gd.police gov.bd লিখে সার্চ করতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট যেমন: র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), কাউন্টার টেররিজম ইউনিট (সিটিইউ), অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) এবং মেট্রোপলিটন পুলিশসহ প্রায় সকল ইউনিটের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (অ্যাপ) যেমন- Report to RAB, Hello CT App ইত্যাদি প্লেস্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিজের মোবাইলে রেখে বিপদের সময় অপরাধ দমনে কাজে লাগাতে পারি। সাইবার জগতে কেউ দুর্ঘটনার শিকার হলে নিকটস্থ থানায় জিডি করে জিডির কপি এবং নিচের তথ্যগুলো সহ Hello CT (Counter Terrorism) বা Report to RAB অ্যাপ্লিকেশনে অপরাধের তথ্য পাঠাতে হবে অথবা জিডির কপিসহ নিকটস্থ থানার সাইবার ক্রাইম হেল্পডেস্কে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে।

## ইন্টারনেট ব্যবহারে নিরাপত্তা কৌশল

নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য এবং অনলাইন হুমকি থেকে ব্যক্তিগত তথ্য এবং ডিভাইসমূহকে রক্ষা করার জন্য নিচের নিরাপত্তা কৌশলগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা-

- টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন (2FA) চালু করা।
- শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা এবং সকল ডিজিটাল প্লাটফর্মে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করা।
- কম্পিউটার সফটওয়্যার ও মোবাইল আপ্লিকেশন সফটওয়্যার (apps) গুলো নিয়মিত আপডেট করা।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য কিংবা গোপনীয় তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকা।
- ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য (পিন কোড বা পাসওয়ার্ড) কারো সাথে শেয়ার না করা।
- ডিভাইসে অ্যান্টিভাইরাস এবং ফায়ারওয়াল সুরক্ষা ইনস্টল করা।

## টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন (2FA)

টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন-এর অর্থ হচ্ছে যখন আমরা আমাদের ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য অনলাইন অ্যাকাউন্টে প্রবেশের জন্য আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করি তখন একটি ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড যা ৬ ডিজিটের হয়ে থাকে) আমাদের ফোনে বা মেইলে আসে। আমরা যখন সেই ওটিপি সঠিকভাবে দেই তখনই কেবল আমরা অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারি, অন্যথায় নয়। OTP সীমিত সময়ের জন্য পাঠানো হয়। একবার ব্যবহার করার পরে OTP এর মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে একই OTP আর ব্যবহার করা যায় না। টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন চালু থাকলে সাইবার অপরাধীর পক্ষে কোনো অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা বেশ কঠিন হয়ে যায়।

বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনে এবং বিনোদনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাবহার করে থাকি। তবে আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে, আমরা কোন কোন ব্যক্তিগত তথ্য সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করব এবং কোনগুলো করব না। হ্যাকাররা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোডকৃত বিভিন্ন কনটেন্ট এর সূত্র ধরে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে কোনো প্রতারণার মাধ্যমে আমাদের অর্থসম্পদ হাতিয়ে নিতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে।

**শিক্ষক ব্যবহারিক ক্লাশে শিক্ষার্থীদের টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন (2FA) চালু করার ধাপগুলো দেখাবেন।**

## কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে আসক্তি

আসক্তি বলে একটা ভীতিকর শব্দ আছে এবং সবাই নিশ্চয়ই এর সাথে পরিচিত। সাধারণত আসক্তি শব্দটা ব্যবহৃত হয় মাদকের সাথে। কোনো একজন ব্যক্তি মাদকে আসক্ত হয়ে গেলে তার জীবনটা কেমনভাবে নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসা কত কঠিন আমরা সবাই সেটা জানি। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির পাঠ্যবইয়ে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার ব্যবহারের মতো এমন চমৎকার একটা বিষয়ের সাথে আসক্তির মতো ভয়ংকর একটা নেতিবাচক শব্দ কেমন করে জুড়ে দেওয়া হলো সেটি নিয়ে তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ। তোমাদের ভেতর যাদের কম্পিউটার আছে, তাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে কম্পিউটার গেম খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ, খেলা বন্ধ করে যখন অন্য একটা জরুরি কাজ করা দরকার তখনো খেলা ছেড়ে উঠতে পারছ না, এরকম অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই কারো কারো হয়েছে। যাদের কম্পিউটারে ইন্টারনেটের যোগাযোগ আছে তাদের কারো কারো হয়ত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে এবং সেই ফেসবুকে তুমি সম্ভবত নিজের সম্পর্কে কোনো তথ্য দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছ কখন সেখানে কেউ লাইক দেবে। ফেসবুকে তোমার বন্ধু বাড়লে তুমি হয়ত আনন্দ পেয়েছ এবং ঠিক কম্পিউটার গেমের মতোই ফেসবুক নামে সামাজিক নেটওয়ার্কে তোমার যতটুকু সময় দেওয়া উচিত তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই তার থেকে অনেক বেশি সময় দিয়েছ। এটা হয়ত খুব অস্বাভাবিক নয় যে তুমি যদি ফেসবুকে এত সময় না দিতে তাহলে তোমার পরীক্ষার ফল আরেকটু ভালো হতো। তুমি আরও কয়েকটা চমৎকার বই পড়তে পারতে। মাঠে আরও একটু বেশি খেলতে পারতে। ভাই-বোন, বাবা-মাকে আরেকটু বেশি সময় দিতে পারতে।

তোমাদের অনেকে কম্পিউটার গেম কিংবা ফেসবুকের মতো কোনো একটা সামাজিক নেটওয়ার্কে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় কর। এতে সত্যিকারের জীবনের খানিকটা হলেও ক্ষতি করছ যারা এমনটি করছ তারা নিশ্চয়ই এখন কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট নামে ইতিবাচক শব্দটির সাথে আসক্তি নামের নেতিবাচক শব্দটা জুড়ে দেওয়ার কারণ বুঝতে পেরেছ! আসক্তি বলতে বোঝানো হয় যখন কেউ জানে কাজটি করা ঠিক হচ্ছে না তারপরও সেই কাজটি না করে থাকতে পারে না। মাদকের জন্যে এটি যেমন হতে পারে ঠিক সেরকম কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও সেটি হতে পারে। মাদক যেমন জীবনের জন্য ক্ষতিকর, বাড়াবাড়ি করা হলে কম্পিউটার কিংবা ইন্টারনেটও সে রকম ক্ষতির কারণ হতে পারে।

### কম্পিউটার গেমে আসক্তি

কম্পিউটার গেমে আসক্তিটা প্রায় সময়েই শুরু হয় শৈশব থেকে এবং বেশিরভাগ সময়ই সেটা ঘটে অভিভাবকদের অজ্ঞতার কারণে। কম্পিউটার একটা tool এবং এটা দিয়ে নানা ধরনের কাজ করা যেতে পারে। এই প্রযুক্তি সম্পর্কে এত সুন্দর সুন্দর কথা বলা হয়েছে যে অনেক সময়ই অভিভাবকরা ধরে নেন এটা দিয়ে যা কিছু করা হয় সেটাই বুঝি ভালো, তাই যখন তারা দেখেন তাদের সন্তানেরা দীর্ঘ সময় কম্পিউটারের সামনে বসে আছে তারা বুঝতে পারেন না তার মাঝে সতর্ক হওয়ার ব্যাপার রয়েছে। কম্পিউটার গেম এক ধরনের বিনোদন এবং এই বিনোদনের নানা রকম মাত্রা রয়েছে। যারা সেটি

খেলছে তারা সেটাকে নিছক বিনোদন হিসেবে নিয়ে মাত্রার ভেতরে ব্যবহার করলে সেটি যেকোনো সুস্থ বিনোদনের মতোই হতে পারে। কিন্তু প্রায় সময়ই সেটি ঘটে না। দেখা গেছে একটি ছোটো শিশু থেকে পূর্ণ বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সবাই কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে যেতে পারে। কোরিয়ায় একজন মানুষ টানা পঞ্চাশ ঘণ্টা কম্পিউটার গেম খেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল, চীনের এক দম্পতি কম্পিউটার গেম খেলার অর্থ জোগাড় করতে তাদের শিশু সন্তানকে বিক্রয় করে দিয়েছিল। এই উদাহরণগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে যাওয়া মোটেও বিচিত্র কিছু নয় এবং একটু সতর্ক না থাকলে একজন খুব সহজেই আসক্ত হয়ে যেতে পারে।

কম্পিউটার কিংবা কম্পিউটার গেমে আসক্তির বিষয়টা যেহেতু নতুন, তাই সেগুলো নিয়ে গবেষণা এখনো খুব বেশি হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে পুরো বিষয়টি নিয়ে গবেষকরা আরও নিশ্চিতভাবে দিক-নির্দেশনা দিতে পারবেন। এখনই গবেষণায় দেখা গেছে কোনো একটা কম্পিউটার গেমে তীব্রভাবে আসক্ত একজন মানুষের মস্তিষ্কে বিশেষ উত্তেজক রাসায়নিক দ্রব্যের আবির্ভাব হয়। শুধু তাই নয় যারা সপ্তাহে অন্তত ছয় দিন টানা দশ ঘণ্টা করে কম্পিউটার ব্যবহার করে তাদের মস্তিষ্কের গঠনেও এক ধরনের পরিবর্তন হয়ে যায়।

কাজেই কম্পিউটার গেম চমৎকার একটা বিনোদন হতে পারে– কিন্তু এতে আসক্ত হওয়া খুব সহজ এবং তার পরিণতি মোটেও ভালো নয়, সেটা সবাইকে মনে রাখতে হবে।

## সামাজিক নেটওয়ার্কে আসক্তি

মানুষ সামাজিক প্রাণী এবং মানুষের নিজেদের ভেতর সবসময়েই একধরনের সামাজিক যোগাযোগ ছিল– কিন্তু ইদানীং সামাজিক যোগাযোগের কথা বলা হলে সেটি মানব সভ্যতার সেই চিরন্তন সামাজিক যোগাযোগ বা সামাজিক নেটওয়ার্কের কথা না বুঝিয়ে ইন্টারনেট-নির্ভর সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের নেটওয়ার্কের কথা বোঝানো হয়। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, লিংকডইন, টিকটক, লাইকি– এ ধরনের অনেক সামাজিক যোগাযোগ সাইট রয়েছে যেগুলোতে মানুষ নিজেদের পরিচিতদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে। এক সময় এই সাইটগুলো ছিল কম বয়সী তরুণ-তরুণীদের জন্যে, এখন সব বয়সী মানুষই সেটি ব্যবহার করে। শুধু যে একে অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্যে এটি ব্যবহার করে তা নয়, একটা বিশেষ আদর্শ বা মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেও এটি ব্যবহার করা হয়। যে উদ্দেশ্যে এটি শুরু হয়েছিল যদি এটি সেই উদ্দেশ্যের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে এটি কোনো সমস্যার জন্ম দিত না, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্তি ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর জন্যেই একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে শুরু করছে।

মনোবিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন এবং এখন এটি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত বলা যায় এই সাইটগুলোর সাফল্য নির্ভর করে, সেগুলো কত দক্ষতার সাথে ব্যবহারকারীদের আসক্ত করতে পারে। পুরো কর্মপদ্ধতির মাঝেই যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে কত বেশিবার এবং কত বেশি সময় একজনকে এই সাইটগুলোতে টেনে আনা যায় এবং তাদেরকে দিয়ে কোনো একটা কিছু করানো যায়। যে যত বেশিবার এই সাইট ব্যবহার করবে সেই সাইটটি তত বেশি সফল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অবশ্যই সেটি তত বেশি টাকা উপার্জন করবে। কাজেই কেউ যদি অত্যন্ত সতর্ক না থাকে তাহলে তার এই সাইটগুলোতে পুরোপুরি আসক্ত হয়ে যাবার খুব বড়ো একটা আশঙ্কা রয়েছে।

মনোবিজ্ঞানীরা এই সাইটগুলো বিশ্লেষণ করে আরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আবিষ্কার করেছেন। সব মানুষের ভেতরেই নিজেকে প্রকাশ করার একটা ব্যাপার রয়েছে কিংবা নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ থাকার এক ধরনের

সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেটাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় narcissism বলে– সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোতে মানুষের এই সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে দেয়। সবার ভেতরই তখন নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলার এক ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। জেনে হোক না জেনে হোক ব্যবহারকারীরা নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি তথ্য সবার সামনে উপস্থাপন করতে থাকে, কেউ সেটি দেখলে সে খুশি হয়, কেউ পছন্দ করলে আরও বেশি খুশি হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি অনেকটা আসক্তির মতো কাজ করে এবং একজন ব্যবহারকারী ঘণ্টার পর ঘন্টা এই যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের সময় অপচয় করতে থাকে। সামাজিক যোগাযোগের এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কারণে সারা পৃথিবীতে অনেক সময়ের অপচয় হচ্ছে।

## আসক্তি থেকে মুক্ত থাকার উপায়

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি মাদকের ন্যায় কম্পিউটার গেম বা সামাজিক যোগাযোগ সাইটেও আসক্তি হতে পারে। তাই মাদকে আসক্তির জন্যে যা যা সত্যি, কম্পিউটার গেম বা সামাজিক যোগাযোগের সাইটে আসক্তির জন্যেও সেগুলো সত্যি। তাই আমরা বলতে পারি একবার আসক্ত হয়ে যাবার পর সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা থেকে কখনোই আসক্ত না হওয়া অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। যারা এই আসক্তির ব্যাপারটি জানে না তাদের পক্ষে আসক্ত হয়ে যাবার একটা আশঙ্কা থাকে। কিন্তু তোমরা যারা এই লেখাগুলো পড়ছ, তারা নিশ্চয়ই সতর্ক থাকবে যেন সহজেই আসক্ত না হয়ে যাও।

কম্পিউটার গেম এক ধরনের বিনোদন, কাজেই যারা কম্পিউটার গেম খেলবে তাদেরকে জানতে হবে অন্য যেকোনো বিনোদনের জন্যে যেটা সত্যি কম্পিউটার গেম খেলার বেলাতেও সেটা সত্যি। কম্পিউটার এক ধরনের প্রযুক্তি। তাই অনেকেই কম্পিউটার ব্যবহার করে করা যেকোনো কাজকেই প্রযুক্তির এক ধরনের ব্যবহার বলে মনে করে, সেটা মোটেও সত্যি নয়। কম্পিউটার গেম খেলে মোটেও কম্পিউটার প্রযুক্তি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান হয় না, খেলার আনন্দটা হয়। কাজেই কখনোই কম্পিউটার গেম খেলার কারণে নিজের দৈনন্দিন অন্যান্য কাজে যেন ব্যাঘাত না ঘটে সেটি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

আশা করা যাচ্ছে তোমরা কখনো কম্পিউটার গেমে আসক্ত হবে না, ঠিক সেরকম তোমাদের চারপাশে যারা আছে তাদেরকেও কম্পিউটার গেমে আসক্ত হতে দেবে না। যারা কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে যায়, তাদের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে। যেমন তাদের মাথায় সার্বক্ষণিক শুধু সেই গেমটার ভাবনাই খেলা করে, যখনই তারা সেই গেমটি খেলতে বসে তাদের ভেতরে এক ধরনের অস্বাভাবিক উত্তেজনা ভর করে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে। জোর করে তাদেরকে এই খেলা থেকে বিরত রাখা হলে তাদের শারীরিক অস্বস্তি হতে থাকে। সবচেয়ে যেটা ভয়ের কথা, অনেক কষ্ট করে এই আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া গেলেও হঠাৎ করে কোনো একটা কারণে আবার সেই আসক্তি ফিরে আসতে পারে। যারা কোনো কারণে কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে যায় তারা যদি এই আসক্তি থেকে মুক্ত হতে চায় তাহলে সবার আগে নিজের কাছে স্বীকার করে নিতে হবে যে তাদের আসক্তি জন্মেছে। তারপর তাকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী কী তার একটা তালিকা করতে হবে। সেই তালিকায় কম্পিউটার গেমের জায়গাটুকু কোথায় সেটি নিজেকে বোঝাতে হবে। তার জীবনের সমস্যাগুলোরও একটা তালিকা করতে হবে। সেই তালিকার সমস্যাগুলোর কোনো কোনোটি কম্পিউটার গেমের কারণে হয়েছে সেটাও নিজেকে বোঝাতে

হবে। তারপর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ লেখাপড়া, হোমওয়ার্ক, মাঠে খেলাধুলা, extra curricular activities, পরিবারের সাথে সময় কাটানো, স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ সবকিছুর জন্যে সময় ভাগ করে রাখতে হবে। সেই সব কিছু করার পর যদি কোনো সময় পাওয়া যায় শুধু তাহলেই কম্পিউটার গেম খেলবে বলে ঠিক করে নিতে হবে। ধীরে ধীরে কম্পিউটার গেমে সময় কমিয়ে এনে নিজেকে অন্যান্য সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে।

যারা সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্ত হয়ে গেছে তাদের বেলাতেও আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে একইভাবে অগ্রসর হতে হবে। প্রথমে নিজেকে বোঝাতে হবে এই ধরনের সাইটে অতিরিক্ত সময় দেওয়া আসলে এক ধরনের আসক্তি। প্রত্যেকবার যখন সামাজিক যোগাযোগ সাইটে কিছু একটা দেখতে ইচ্ছা করবে তখন নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে সত্যি কি তার প্রয়োজন আছে? যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে নিজেকে নিবৃত্ত করতে হবে। প্রত্যেকবার যোগাযোগ সাইটে ঢুকলে সেখানে কতটুকু সময় দেওয়া হয়েছে সেটা কোথাও লিখে রাখতে হবে। দিনে কত ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়, সপ্তাহে কত ঘণ্টা, মাসে কত ঘণ্টা সেটা হিসাব করে সেই সময়টাতে সত্যিকারের কোনো কাজ করলে কতটুকু কাজ করা যেত সেটা নিজেকে বোঝাতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্তি কমাতে হলে সেখান থেকে যোগাযোগের প্রয়োজন নেই এমন মানুষদের কাটছাঁট করে সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। অন্য সব কাজ শেষ হওয়ার পর সময় থাকলেই এই সাইটে ঢোকা যাবে– এটি নিজেকে বোঝাতে হবে। পরীক্ষা কিংবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট-এর সাথে সামাজিক যোগাযোগ সাইট deactivate করে ফেলার অভ্যাস করতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে নিজেকে অভ্যস্ত করে আসক্তিটুকু কমাতে কমাতে এক সময় পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে।

মনে রাখতে হবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। সেই মুহূর্তগুলো সত্যিকার কাজে ব্যয় না করে কোনো একটি আসক্তির পেছনে ব্যয় করা খুব বড়ো অপরাধ!

## পাইরেসি

লেখক, শিল্পীসহ সৃজনশীল কর্মীদের তাদের নিজেদের সৃষ্টকর্মকে সংরক্ষণ করার অধিকার দেওয়া কপিরাইট আইনের লক্ষ্য। সাধারণভাবে, একটি মুদ্রিত পুস্তকের কপিরাইট ভঙ্গ করে সেটি পুনর্মুদ্রণ করা যথেষ্ট ঝামেলাপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল। কিন্তু কম্পিউটারের বেলায় যেকোনো কিছুর 'কপি' বা 'অবিকল প্রতিলিপি' তৈরি করা খুবই সহজ কাজ। এজন্য এমনকি বিশেষজ্ঞ হওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণে কম্পিউটার সফটওয়্যার, কম্পিউটারে করা সৃজনশীল কর্ম যেমন ছবি, এনিমেশন ইত্যাদির বেলায় কপিরাইট সংরক্ষণ করার জন্য বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হয়। যখনই এরূপ কপিরাইট আইনের আওতায় কোনো কপিরাইট হোল্ডারের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় তখনই কপিরাইট বিঘ্নিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ধরনের ঘটনাকে সাধারণভাবে পাইরেসি বা সফটওয়্যার পাইরেসি নামে অভিহিত করা হয়।

কপিরাইট আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা, নির্মাতা বা প্রোগ্রামার তাদের কম্পিউটার সফটওয়্যারের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করতে পারেন। ফলে, তাদের অনুমতি ব্যতীত ওই সফটওয়্যারের প্রতিলিপি করা বা সেটির পরিমার্জন করে নতুন কিছু সৃষ্টি করা আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়ে যায়। ফলে, কপি বা নতুন সৃষ্টির আইনগত ভিত্তি আর থাকে না। কম্পিউটার সফটওয়্যারের পাইরেসি সোজা হলেও বিশ্বব্যাপী পাইরেসির প্রকোপ খুব বেশি একথা বলা যায় না। বড়ো বড়ো সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো তাদের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও বিশ্বব্যাপী পাইরেসি নজরদারি করার জন্য বিজনেস সফটওয়্যার এলায়েন্স (BSA) নামে একটি সংস্থা তৈরি

করেছে। সংস্থাটির ২০১১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে–পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনই পাইরেসিমুক্ত। যেহেতু সফটওয়্যার পাইরেসি খুবই সহজ, তাই এর হিসাব করাটা কঠিনই বটে। বাংলাদেশেও সফটওয়্যার পাইরেসি নিষিদ্ধ।

## কপিরাইট আইনের প্রয়োজনীয়তা

কপিরাইট আইন সৃজনশীল কর্মের স্রষ্টাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার সৃষ্টকর্মের ওপর 'মালিকানা' বা স্বত্বাধিকার দেয়। ফলে, কোনো সৃষ্টকর্মের বাণিজ্যিক মূল্য থাকলে সেটি তার স্রষ্টাই পান, অন্যরা নন। যেহেতু প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অর্থ প্রয়োজন, সেহেতু কবি, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সফটওয়্যার নির্মাতা, ওয়েবসাইট ডিজাইনকারী সবারই অর্থের প্রয়োজন। তারা তাদের সৃজনশীল কর্ম সৃষ্টির জন্য পরিশ্রম, মেধা এবং কখনো কখনো অর্থও বিনিয়োগ করেন। কাজেই, সৃষ্টকর্ম বিক্রি বা বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁকে তার বিনিয়োগের সুফল তুলতে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন অনেকেই। কপিরাইট আইনের আওতায় প্রাপ্ত আইনগত অধিকার তাদের সেই সুবিধাই দেয়।

যদি কোনো শিল্পী বা প্রোগ্রামার দেখতে পান যে, তার দীর্ঘদিনের শ্রম ও মেধার ফসল অন্যরা কোনোরূপ স্বীকৃতি বা বিনিময় মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ছাড়া উপভোগ বা ব্যবহার করছে তাহলে তিনি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। কপিরাইট আইনের কার্যকারিতা সৃজনশীল কর্মীদের এই নিরুৎসাহিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

## তথ্য অধিকার ও নিরাপত্তা

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার (right to information) আইন প্রণীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ২০০৯ সালে বাংলাদেশে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" নামে একটি আইন চালু হয়েছে। এই আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পেরিক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকেন। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আইনে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংস্থাসমূহকে তথ্য সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফলে জনগণের যেকোনো বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তি সহজ হয়েছে।

এই আইনের ফলে অনেকের পক্ষে রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সকল তথ্যের গোপনীয়তার সঙ্গে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত, সে সকল ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রকাশকে বাধ্যতামূলক রাখা হয়নি। যেমন ধরা যাক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র প্রকাশের জন্য কোনো সংস্থাকে এই আইনের আওতায় বাধ্য করা হলে তা সম্পূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে, যা কাঙ্ক্ষিত নয়। এ কারণে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা তথ্য অধিকার আইন সংরক্ষণ করে। একইভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু কৌশলগত, কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক

তথ্য প্রকাশিত হলে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সে সকল তথ্য গোপন রাখাটা এই আইনের লঙ্ঘন নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যদি কোনো তথ্য প্রকাশ করা হলে দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়, তাহলে তা এ আইনের আওতায় প্রকাশযোগ্য নয়।

## সাধারণ ট্রাবলশুটিং

ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করবে অথচ কখনো সেটি বিগড়ে যায়নি বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করেনি এমন অভিজ্ঞতার মানুষ পৃথিবীতে বিরল। কিছু কিছু সমস্যা খুবই সাধারণ আবার কিছু সমস্যা জটিল। সাধারণ সমস্যাগুলো অনেক সময় ব্যবহারকারীরাই ঠিক করে ফেলতে পারে। জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কারও মাধ্যমে ঠিক করাতে হয়। কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। তোমরা যারা ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার কর তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ প্রত্যেকটি যন্ত্রের সাথে একটি করে ম্যানুয়াল বা ব্যবহার নির্দেশিকা থাকে। এ নির্দেশিকার একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর শেষদিকে এক বা দুটি পৃষ্ঠা থাকে যার শিরোনাম হলো ট্রাবলশুটিং। ট্রাবলশুটিং অংশে সাধারণ সমস্যার প্রকৃতি ও এর সমাধান দেওয়া থাকে।

ট্রাবলশুটিং হচ্ছে সমস্যার উৎস বা উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের প্রক্রিয়া। সাধারণত কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয় এবং পাশাপাশি সমাধান দেওয়া থাকে। ব্যবহারকারী তার সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী সমাধান অনুসরণের মাধ্যমে বেশিরভাগক্ষেত্রে সমস্যাটি সমাধান করতে পারে।

মূলত ট্রাবলশুটিং হচ্ছে এমন কিছু যা, একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে করতে হয়। অন্য যেকোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রের তুলনায় কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রের ট্রাবলশুটিং একটু বেশিই প্রয়োজন হয়। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে এ যন্ত্রগুলো আমরা অনেক বেশি সময় ধরে ব্যবহার করি। তাই আইসিটির ব্যবহারকারীদের অবশ্যই সাধারণ ট্রাবলশুটিং সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সাধারণত হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত সমস্যার ক্ষেত্রে ট্রাবলশুটিং কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরের পৃষ্ঠায় কিছু ট্রাবলশুটিং নিয়ে আলোচনা করা হলো।

## ডেস্কটপ কম্পিউটারের কিছু সাধারণ সমস্যা ও সমাধান

| ক্রমিক | সমস্যা | সাধারণ সমাধান |
|---|---|---|
| ১. | সিস্টেম চালু হচ্ছে না | ১. মেইন পাওয়ার ক্যাবলের সংযোগটি loose বা ঢিলে কিনা দেখতে হবে।<br>২. মেইন বোর্ডে পাওয়ার আসছে কিনা দেখতে হবে।<br>৩. মেইন বোর্ডে যদি পাওয়ার না আসে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট পরিবর্তন করতে হবে।<br>৪. স্থানীয় কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দেখতে হবে। |
| ২. | সিস্টেম সঠিকভাবে চলছে কিন্তু মনিটরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। | ১. মনিটরের বাতি জ্বলছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। যদি বাতি জ্বলে তাহলে মনিটরের ডেটা ক্যাবলটি পরীক্ষা করতে হবে এবং ক্যাবলটি খোলা বা লুজ থাকলে তা সঠিকভাবে লাগাতে হবে।<br>২. সিস্টেমটি বন্ধ কর এবং মেইন সিস্টেম থেকে পাওয়ার ক্যাবলটি খুলে ফেলতে হবে (সতর্কতার জন্য)।<br>৩. মেমোরি স্লট থেকে সকল র‍্যাম (Ram) সরিয়ে ফেল।<br>৪. একটি ইরেজার (rubber) দিয়ে র‍্যাম-এর কানেক্টরগুলোকে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।<br>৫. শক্ত ব্রাশ দিয়ে সবগুলো র‍্যাম স্লটকে পরিষ্কার করতে হবে।<br>৬. র‍্যাম ইনস্টল না করে কম্পিউটারটি চালু কর এবং কোনো beep সাউন্ড হয় কিনা খেয়াল করতে হবে।<br>৭. যদি beep সাউন্ড শুনতে পাও তবে কম্পিউটার বন্ধ করে র‍্যাম ইনস্টল করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে।<br>৮. যদি কোনো beep সাউন্ড হয় তবে বুঝতে হবে র‍্যামটি সমস্যাযুক্ত।<br>৯. এবারও display না আসলে নতুন র‍্যাম লাগাতে হবে।<br>১০. র‍্যামকে প্রতিস্থাপন করে আবার চেক কর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে display না হওয়ার কারণ র‍্যাম-এর সমস্যা। শেষ পর্যন্ত সমাধান না হলে স্থানীয় কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দেখাতে হবে। |
| ৩. | সিস্টেম অত্যন্ত গরম হয়ে যায় এবং অস্বাভাবিকভাবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। | ১. কেসিং টি খোল।<br>২. মাদারবোর্ড থেকে সতর্কতার সাথে CPU তথা প্রসেসর ফ্যানটি সরাতে হবে। কিন্তু প্রসেসর সরানো যাবে না।<br>৩. হয়ত দেখবে ভেতরে বা Heat sink-এ প্রচুর ধুলোবালি জমে আছে, যা বায়ু চলাচলকে বাধাগ্রস্থ করছে। ফলে CPU ঠান্ডা হতে পারছে না।<br>৪. Heat sink এবং ফ্যানটিকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পুনরায় ইনস্টল কর। এবার কেবিনেটটি বন্ধ করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে।<br>৫. সমাধান না হলে স্থানীয় কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দেখাতে হবে। |

| ক্রমিক | সমস্যা | সাধারণ সমাধান |
|---|---|---|
| ৪. | কোনোরূপ উত্তপ্ত হওয়া ছাড়াই কম্পিউটারটি কয়েক মিনিট পরপর shutdown হয়ে যাচ্ছে। | ১. সতর্কতার সাথে মাদারবোর্ডটি ভালো করে দেখে নাও। লিকযুক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ ক্যাপাসিটির উপর থেকে খুলে আসছে এরূপ চোখে পড়ে কিনা খেয়াল কর। এক্ষেত্রে ক্যাপাসিটরকে ভালো করে লাগিয়ে নিলেই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে।<br>২. খুব সতর্কতার সাথে চালু অবস্থায় কম্পিউটারটি খেয়াল কর কোনো IC বা কম্পোন্যান্ট অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন করছে কিনা। তবে সাবধান, বোর্ডটা যেন shorted না হয়ে যায়। যদি তেমন হয় তবে মেরামতের জন্য তোমার নিকটস্থ সার্ভিস সেন্টারে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। |
| ৫. | উইন্ডোজ রান করার সময় আটকে বা হ্যাং/hang হয়ে যায়। | ১. আপগ্রেড এন্টিভাইরাস চালিয়ে হার্ডডিস্কে কোনো প্রকার ভাইরাস আছে কিনা চেক করে ক্লিন করে নিতে হবে।<br>২. হার্ডডিস্ক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা অন্যত্র ব্যাকআপ নিয়ে হার্ডডিস্কের "C" ড্রাইভ ফরম্যাট করে নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করতে হবে। কাজটি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে করানো ভালো। |
| ৬. | পাওয়ার অন করলে display আসার পর কম্পিউটার hang হয়ে যায়। | ১. **প্রথম ধাপ :** কম্পিউটারের পাওয়ার অফ কর এবং কেসিংয়ের একপার্শ্বে খুলে হার্ডডিস্ক, সিডিরম কিংবা ডিভিডি-এর সাথে সংযুক্ত ডাটা ক্যাবল এবং পাওয়ার ক্যাবলসমূহ সাবধানে খুলে ফেল এবং এগুলো পর্যায়ক্রমে স্ব স্ব স্থানে যথাযথভাবে সংযোগ দিয়ে পুনরায় কম্পিউটার চালু করে দেখ। যদি সমস্যা থেকে যায় তাহলে–<br>২. **দ্বিতীয় ধাপ :** মাদারবোর্ড থেকে RAM, Processor, Power supply connection প্রত্যেকটি আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোনো প্রকার ত্রুটি কিংবা ক্যাবল কানেকশনের সংযোগস্থলে লুজ আছে কিনা? এরপরও যদি একই সমস্যা থাকে তাহলে–<br>৩. **তৃতীয় ধাপ :** অন্য একটি ভালো কম্পিউটার থেকে প্রসেসর র‍্যাম, হার্ডডিস্ক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এই মাদারবোর্ডে ব্যবহার করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে মাদারবোর্ডটি ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক না থাকে তাহলে মাদারবোর্ড বদলিয়ে ফেলতে হবে। কাজটি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে করাতে হবে।<br>**নোট :** অনেক সময় কেসিংয়ের পিছনে মাদারবোর্ডটির কীবোর্ড এবং মাউস পোর্টের সংযোগ লুজ থাকলেও এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে যথাযথভাবে সংযোগ দিতে হবে। |

| ক্রমিক | সমস্যা | সাধারণ সমাধান |
|---|---|---|
| ৭. | কম্পিউটার ঘন ঘন হ্যাং করে বা রিবুট/রিস্টার্ট হয়ে যায়। | ১. কম্পিউটারের সিপিইউর উপর সংযুক্ত কুলিং ফ্যানটি না ঘুরলে কিংবা পর্যাপ্ত ঠান্ডা করতে না পারলে এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে কম্পিউটারের পাওয়ার অফ করে কেসিং খুলে কুলিং ফ্যানটিকে ভালোভাবে চেক করে প্রয়োজনে নতুন কুলিং ফ্যান স্থাপন করে নাও। এছাড়াও কম্পিউটার চলাকালীন তোমার সিপিইউর পিছনে কেসিং-এর ফ্যানটি ঘুরে কিনা তাও চেক করতে হবে।<br>২. কম্পিউটারে ভাইরাস থাকলেও এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। তাই আপগ্রেড এন্টিভাইরাস দ্বারা কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ড্রাইভের প্রতিটি ড্রাইভ ক্লিন করে নিতে হবে। এছাড়া অনেক সময় নতুন সফ্টওয়্যার বা প্রোগ্রাম লোড করার কারণেও এটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রোগ্রামটি আনইনস্টল করে দেখা যেতে পারে। |
| ৮. | কম্পিউটারের মেটাল অংশে স্পর্শ বা হাত লাগলে শক্ করে। | ১. কম্পিউটারের গায়ে তথা মেটাল অংশে স্পর্শ করলে যদি শক্ করে তাহলে বুঝতে হবে কম্পিউটারটি আর্থিং করা নেই। সেক্ষেত্রে একজন পারদর্শী ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা যথাযথভাবে আর্থিং করিয়ে নিতে হবে। |
| ৯. | কম্পিউটারের তারিখ এবং সময় ঠিক থাকে না।<br>অথবা<br>বায়োসের কোনো অপশন পরিবর্তন করলে তা সেভ হয় না। | ১. মাদারবোর্ডে সংযুক্ত CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) এর ব্যাটারিটি কার্যক্ষমতা হারালে এটি ঘটে। এক্ষেত্রে একটি নতুন অনুরূপ ব্যাটারি মাদারবোর্ডে লাগিয়ে দিতে হবে। |
| ১০. | Boot Disk Failure or Hard Disk Not Found মেসেজ দেখায়। | ১. কম্পিউটারের পাওয়ার বন্ধ করে কেসিং খুলে মাদারবোর্ড এবং হার্ডডিস্ক ড্রাইভের সাথে সংযুক্ত ডেটা ক্যাবল এবং পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে হার্ডডিস্কে সংযুক্ত পাওয়ার ক্যাবলটির সংযোগস্থলে কোনো লুজ আছে কিনা তা প্রত্যক্ষ করে সঠিকভাবে কানেক্ট করতে হবে।<br>২. হার্ডডিস্কের পিছনের জাম্পার সেটিং ডায়াগ্রাম অনুসরণ করে ড্রাইভটির জাম্পার সেটিং ঠিক আছে কিনা তা দেখে সঠিকভাবে জাম্পার সেটিং করতে হবে।<br>৩. কম্পিউটার চালিয়ে বায়োসে প্রবেশ করে হার্ডডিস্ক ড্রাইভটিকে বায়োসের অপশন থেকে অটো কিংবা ম্যানুয়ালি ডিটেক্ট করে কিনা তা দেখ। যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে অন্য একটি ভালো কম্পিউটারে তোমার হার্ডডিস্কটিকে লাগিয়ে দেখ হার্ডডিস্কটি কাজ করে কিনা? যদি কাজ না করে তাহলে নিশ্চিন্তে অন্য একটি হার্ডডিস্ক ক্রয় করে কম্পিউটারের সাথে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ইনস্টল করে ফেল। কাজটি অবশ্যই অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে করাতে হবে। |

| ক্রমিক | সমস্যা | সাধারণ সমাধান |
|---|---|---|
| ১১. | Out of Memory or Not Enough Memory মেসেজ দেখায়। | ১. সাধারণত কম্পিউটারের অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে গিয়ে কিংবা একাধিক প্রোগ্রাম একসাথে ওপেন করে কাজ করতে গেলে এ ধরনের ম্যাসেজ প্রদর্শিত হয়।<br>২. কম্পিউটারে অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল করার মতো পর্যাপ্ত মেমোরি না থাকলে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সমস্যা দূর করার জন্য মাদারবোর্ডে অধিক র‍্যাম ব্যবহার করতে হবে। |
| ১২. | কীবোর্ড কাজ করছে না | ১. কম্পিউটারটি বন্ধ করে কীবোর্ডটি পোর্টের সাথে যথাযথভাবে সংযোগ করা আছে কিনা সে বিষয়টি লক্ষ করতে হবে।<br>২. যদি সংযোগ না থাকে কিংবা লুজ থাকে তাহলে ভালোভাবে সংযোগ দিয়ে পুনরায় কম্পিউটার চালু করে দেখতে হবে।<br>৩. এন্টিভাইরাস দ্বারা ভাইরাস ক্লিন করে দেখতে হবে।<br>৪. এরপরও যদি কীবোর্ড কাজ না করে তাহলে নতুন কীবোর্ড লাগিয়ে নিতে হবে। |
| ১৩. | মাউস ডিটেক্ট করে না কিংবা মাউস কাজ করে না | ১. কম্পিউটারের সাথে মাউসের ক্যাবল সংযোগ ঠিক আছে কিনা দেখ এবং ভালোভাবে লাগিয়ে পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে।<br>২. পোর্ট পরিবর্তন করে দেখতে হবে।<br>৩. অন্য একটি ভালো মাউস পোর্টে লাগিয়ে দেখতে হবে।<br>৪. বায়োসে প্রবেশ করে দেখ মাউস ডিজ্যাবল করা আছে কিনা? যদি থাকে এনাবল করে দিয়ে সেভ করে বায়োস থেকে বের হয়ে আসতে হবে।<br>৫. এরপরও যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহালে ভালো একটি মাউস লাগিয়ে নাও। সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। |
| ১৪. | মনিটরে কোনো পাওয়ার নেই। | ১. পাওয়ার বোতাম (বা সুইচ) চালু আছে কিনা।<br>২. AC পাওয়ার কর্ডটি মনিটরের পেছনে এবং পাওয়ার আউটলেটে ভালোভাবে সংযুক্ত আছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে। |
| ১৫. | মনিটরের পাওয়ার অন/চালু কিন্তু পর্দায় কোনো ছবি নেই। | ১. মনিটরের সাথে সরবরাহকৃত ভিডিও ক্যাবলটি কম্পিউটারের পেছনে মজবুতভাবে লাগানো হয়েছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে। যদি ভিডিও ক্যাবলের অপর প্রান্তটি স্থায়ীভাবে মনিটরের সাথে যুক্ত না থাকে, তাহলে এটিকে দৃঢ়ভাবে লাগিয়ে দিতে হবে।<br>২. ব্রাইটনেস (brightness) এবং কন্ট্রাস্ট (contrast) ঠিক করে দেখতে হবে। |

| ক্রমিক | সমস্যা | সাধারণ সমাধান |
|---|---|---|
| ১৬. | প্রিন্টারে প্রিন্ট হচ্ছে না। | ১. সঠিক মডেলের প্রিন্টার নির্বাচন করা হয়েছে কিনা হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে।<br>২. প্রিন্টারের সাথে পাওয়ার ক্যাবলটি সংযুক্ত আছে কিনা দেখতে হবে।<br>৩. প্রিন্টার অন/চালু করা আছে কিনা দেখতে হবে।<br>৪. কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টারের ডেটা ক্যাবল সংযুক্ত আছে কিনা দেখতে হবে।<br>৫. প্রিন্টারের ভিতরে কোনো প্রকার কাগজ কিংবা অন্য কোনো কিছু আটকে আছে কিনা তা প্রিন্টার খুলে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে।<br>৬. প্রিন্টারের কার্টিজে কালি আছে কিনা তা দেখ অথবা প্রিন্টার থেকে কার্টিজটি খুলে ভালোভাবে নেড়ে পুনরায় কার্টিজটিকে যথাযথ স্থানে স্থাপন করে দেখতে হবে।<br>৭. প্রিন্টার চালু করার সাথে সাথে যদি লাল কিংবা ব্লিংকিং হলুদ বাতি জ্বলতে থাকে তাহলে প্রিন্টারের রিসেট বাটনে চাপ দিতে হবে।<br>৮. যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে নতুন করে প্রিন্টারের সাথে সরবরাহকৃত ড্রাইভার সফ্টওয়্যারটি ইনস্টল করতে হবে।<br>৯. হার্ডওয়্যারে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করতে হবে। |

দলগত কাজ

উপরিউক্ত সমস্যাসমূহ ছাড়াও কম্পিউটারে আর কী কী সমস্যা হতে পারে তা আলোচনা করে সমাধানের উপায় চিহ্নিত কর।

## অনুশীলনী

১. টেম্পোরারি ফাইল বেশি হলে কী ঘটে?

ক. কম্পিউটার স্লো হয়ে যায় খ. কম্পিউটারের গতি বেড়ে যায়

গ. এন্টিভাইরাস কাজ করে না ঘ. ইন্টারনেটে প্রবেশ করা যায় না

২. সিডি, ডিভিডি বা পেন ড্রাইভ থেকে সফটওয়্যার ইনস্টল করতে গেলে কোন প্রোগ্রামটি প্রথমে চালু হয়?

ক. Setup খ. Autorun

গ. Read me ঘ. Restart

৩. কোনটি আধুনিক পৃথিবীর সম্পদ?

ক. তথ্য খ. উপাত্ত

গ. কম্পিউটার ঘ. ইন্টারনেট

৪. সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হলে অবশ্যই দেখতে হবে–

i. হার্ডওয়্যার সেটিকে সাপোর্ট করে কিনা

ii. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি বন্ধ করা হয়েছে কিনা

iii. এডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি আছে কিনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।**

ইকরাম সাহেব দেখছেন কয়েকদিন ধরে তার কম্পিউটার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় আবার চালু হয়। আরও লক্ষ করলেন কম্পিউটারটির কাজের গতিও কমে গেছে। তার মনে পড়লো বন্ধুর পেনড্রাইভ থেকে একটি গান কপি করার পর থেকে এটা শুরু হয়েছে।

৫. কম্পিউটারের এ অবস্থার জন্য কোনটি দায়ী?

ক. অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার খ. ভাইরাস সফটওয়্যার

গ. ইউটিলিটি সফটওয়্যার ঘ. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার

৬. এর ফলে ইকরাম সাহেবের কম্পিউটারে–

i. অপ্রত্যাশিত কোনো বার্তা প্রদর্শন করতে পারে

ii. রাখা ফাইলগুলোর আকার বেড়ে যেতে পারে

ii. মেমোরি কম দেখাতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. তোমার এক বন্ধু প্রায়ই কম্পিউটারে গেমস খেলে। এতে তার কী কী ক্ষতি হতে পারে? বর্ণনা কর।

৮. 'কম্পিউটারের সাধারণ ট্রাবলশ্যুটিং জেনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' - উক্তিটি যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।